ডিজিটাল বাংলাদেশ একুশের পরে

মোস্তাফা জব্বার, *মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়*

একুশের পরে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। ২০২১ সাল হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঠিকানা। তবে ২০১৮ সালেই সেই সময়সীমার বাইরে ভাবতে হচ্ছে। আরও স্পষ্ট করে বললে, এটি বলতেই হবে যে, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা তার দলের নির্বাচনী ইশতেহারে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করার অংশ হিসেবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। রূপকল্প ঘোষণার বিষয়টি ২০০৬-এর পরে বিকশিত হয়।

রূপকল্প ২০২১ ঘোষণার সময়ের প্রেক্ষিতটাও জানা দরকার। '২১ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করবে বলেই রূপকল্প ২০২১ নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি আমরা আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরকে ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর সাথে যুক্ত করেছি বলে আমাদের সার্বিক স্বপ্নটি ২০২০-২১ সালকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। সেই সময় অবধি আমাদের যাত্রাপথও আমরা চিহ্নিত করেছি। সেই পথচলা আমাদের অব্যাহত রয়েছে। তবে এখন সময় হয়েছে একুশ সালের পরের ভাবনাও ভাববার। বিশেষ করে সাম্প্রতিক প্রযুক্তির বিকাশ ও রূপান্তর আমাদেরকে সব প্রেক্ষিতটাই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। আমার নিজের কাছে মহাশক্তিধর বা সার্বিক রূপান্তরের প্রযুক্তি হিসেবে ৫জিকে মনে হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা, আইওটিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি।

ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষিত প্রস্তাবনা

২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে তার সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করতে নিয়োজিত করেন। এমনকি তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে তিনি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা নিয়োগ করেন, যিনি বস্তুত সরকারের এসব কর্মযজ্ঞে অসাধারণ নেতৃত্ব দেন। তার প্রজ্ঞা, মেধা ও সৃজনশীলতা দেশের ডিজিটাল রূপান্তরে ব্যাপকভাবে কাজে লাগে। নীতিনির্ধারণ থেকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এই সময়কালে সরকার ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছে। এরই মাঝে ২০১৪ সালে আরও একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সময়েও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও একটি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে বাংলাদেশের অগ্রগতির লক্ষ্যকে ২০৪১ সাল অবধি সম্প্রসারিত করেন। আমি আগেই বলেছি, তখন তিনি দেশটিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেন। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি একটি সফল শাসনকাল অতিক্রম করছেন। ২০১৮ সালেই আরও একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে দেশে। বদলে যাওয়া প্রেক্ষিত, নতুন প্রযুক্তি, নতুন বিশ্বব্যবস্থা তথা সার্বিক বিবেচনায় মনে হচ্ছে যে, এবার বাংলাদেশকে তার নিজের ভাবনাগুলোকে আরও অগ্রসর করতে হবে। ২০১৮ সালে বসে আমরা শুধু জ্ঞানভিত্তিক সমাজ, ডিজিটাল ইকোনমি, শিল্পবিপ্লব ৪.০, ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব বা সৃজনশীল অর্থনীতি ইত্যাদির মাঝেই সীমিত থাকতে পারি না। বস্তুত আমাদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভাবনাটি আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। আমাদের এখন সময় হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের একুশপরবর্তী ভাবনাগুলোকেও সমন্বিত করা।

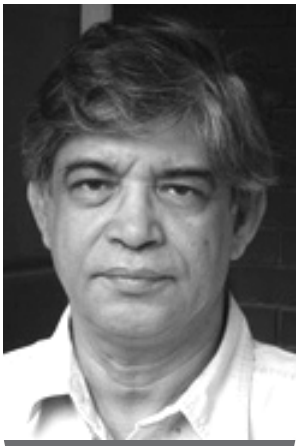

মোস্তাফা জব্বার

মনে রাখা দরকার, শেখ হাসিনা এরই মাঝে ২০৪১ সালের লক্ষ্যের কথাও ঘোষণা করেছেন। লক্ষণীয়, সারা দুনিয়া এখন তো আর ২০০৮ সালে নেই। আমরা তখন আমাদের লক্ষ্য অর্জনে যেসব প্রযুক্তির কথা বলেছিলাম, তা ডিজিটাল হলেও বিগত এক দশকে আমরা এমনসব প্রযুক্তির মুখোমুখি হয়েছি যার কথা যদি বিবেচনায় না নেয়া হয়, তবে আমরা গন্তব্যে পৌঁছানোর যথাযথ পথটি খুঁজে পাব না বা উপযুক্ত হাতিয়ারও ব্যবহার করতে পারব না।

আদিযুগে মানুষ প্রধানত প্রকৃতিনির্ভর ছিল। বস্তুত কৃষিযুগ ছিল মানুষের সৃজনশীলতার প্রথম ধাপ যখন সে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এরপর অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যান্ত্রিক যুগ বা শিল্পবিপ্লবের যুগের সূচনা হয়। সেটিকে এখন সবাই শিল্পবিপ্লবের প্রথম স্তর বলে চিহ্নিত করে। বর্তমানে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় প্রচলিত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটালেও শিক্ষিত মানুষের বেকারত্ব এসব রাষ্ট্রের জন্য বিশাল ও ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এর কারণ খুবই সরল অঙ্কে দেখা যায়। প্রথম শিল্পযুগের শিক্ষা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য দক্ষতা দিতে পারে না। অবস্থাটি আরও বদলাবে এবং শিক্ষিত মানুষের বেকারত্বের চাপটি আরও বাড়বে। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে প্রচলিত জ্ঞান নিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে টিকে না থাকার সম্ভাবনা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রচলিত কারখানা, প্রচলিত শ্রম, বিদ্যমান অফিস-আদালত, ব্যবসায় বাণিজ্য, সরকার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও জীবনধারার অকল্পনীয় রূপান্তর ঘটছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এটি অন্যদের– বিশেষত শিল্পোন্নত ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জযুক্ত।

আমরা তিনটি শিল্পবিপ্লবের রূপান্তর মিস করার ফলে আমাদের নাগরিকদেরকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য ন্যূনতম যোগ্য করে তুলতে ▸

পারিনি। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই বিশ্বসভ্যতা ডিজিটাল যুগে পা দিলেও এখন বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, আইওটি, বিগডাটা এবং ৫জি মোবাইল ব্রডব্যান্ডের যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যারা দুনিয়ার ডিজিটাল বিপ্লব, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, ডিজিটাল সমাজ, সৃজনশীল অর্থনীতি, ডিজিটাল অর্থনীতি, ই-দেশ, ইউবিকুটাস দেশ ইত্যাদি বলছি তাদেরকেও বুঝতে হবে নতুন প্রযুক্তিসমূহ বিশ্বকে একটি অচিন্তনীয় যুগে নিয়ে যাচ্ছে। এখনই এসব প্রযুক্তির অতি সামান্য প্রয়োগ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটাচ্ছে। আগামীতে আমরা এসব প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে পারব কি না, সেটিই ভাবনার বিষয়।

অন্যসব আলোচিত নবতর প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, আইওটি, ব্লকচেইন ইত্যাদির আলোচনা কমও যদি করি, তবুও এটি বলতেই হবে, মোবাইলের প্রযুক্তি যখন ৪জি থেকে ৫জিতে যাচ্ছে, তখন দুনিয়া একটি অভাবনীয় রূপান্তরের মুখোমুখি হচ্ছে। আমরা ৫জির প্রভাবকে যেভাবে আঁচ করছি, তাতে পৃথিবীতে এর আগে এমন কোনো যোগাযোগ প্রযুক্তি আসেনি, যা সমগ্র মানবসভ্যতাকে এমনভাবে আমূল পাল্টে দেবে। ২০২০ সাল নাগাদ এই প্রযুক্তি বিশ্ববাসী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে। মোবাইলের এই প্রযুক্তি ক্ষমতার একটু ধারণা পাওয়া যেতে পারে এভাবে যে, আমরা এখন যে ৪জি প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, তার গতির হিসাব এমবিপিএসে। অন্যদিকে ৫জির গতি জিবিপিএসে। এমন ৫জির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, আইওটি, বিগ ডাটা, ব্লকচেইন বা এ ধরনের যুগান্তকারী ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমনি করে নতুন সুযোগ তৈরি করছে, তেমনি করে নতুন চ্যালেঞ্জেরও জন্ম দিচ্ছে। আমাদের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয় হবে যে, আমরা যেন প্রযুক্তিকে আমাদের জনগোষ্ঠী, সমাজ-সংস্কৃতি ও দেশ-কালের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করতে পারি।

এসব প্রযুক্তি একদিকে জীবনকে বদলে দেবে, অন্যদিকে কায়িক শ্রমকে ইতিহাস বানিয়ে দেবে। আমাদের মতো জনবহুল কায়িক শ্রমনির্ভর দেশের জন্য এটি একটি মহাচ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে আমাদের মতো তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশের জন্য সেই জনগোষ্ঠীকে এসব প্রযুক্তিজ্ঞানসমৃদ্ধ করে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব জয় করার একটি অপার সম্ভাবনাও তৈরি করছে এইসব প্রযুক্তি।

আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রযুক্তি ও জীবনধারায় পেছনে থাকার বদলে দুনিয়াকে ডিজিটাল যুগে নেতৃত্ব দেয়া। আমাদের জন্য স্বপ্ন হচ্ছে ২০২১ ও ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন করা।

মহাশক্তিধর পঞ্চম প্রজন্মের সংযুক্তি আসছে

আজ আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি। সচরাচর প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের জন্য একটি অভাবনীয় ঘটনা ছিল ২৫ জুলাই ২০১৮ খোদ ঢাকা শহরে ৫জির পরীক্ষামূলক প্রচলন করা। বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চীনা কোম্পানি হুয়াওয়ে এবং মোবাইল ফোন কোম্পানি রবির সহায়তায় ৫জি প্রযুক্তির কর্মযজ্ঞ সরাসরি দেখা হয়। যারা সোনারগাঁও হোটেলে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারা বস্তুত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি আমি। এতে বক্তব্য পেশ করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার, রবির প্রধান নির্বাহী মাহতাব আহমদ এবং হুয়াওয়ের প্রতিনিধি। বিটিআরসির পক্ষ থেকে ৪জির সম্প্রসারণের চলমান অবস্থার প্রতিবেদন পেশ করার পাশাপাশি জিএসএমের প্রতিনিধি ৫জির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের জন্য এই পরীক্ষা করার বিষয়টি ছিল এক অসাধারণ ঘটনা। ঐতিহাসিকভাবে পেছনে পরে থাকা দেশ হিসেবে বরাবর আমরা অন্যরা প্রযুক্তি গ্রহণ করার অনেক পরে সেইসব প্রযুক্তির ধারেকাছে যাই। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে সিডিএমএ প্রযুক্তির সিটিসেল দিয়ে মোবাইল ফোনের সূচনা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে মোবাইলের বিপ্লব ঘটা শুরু করে '৯৭ সালে জিএসএম ফোন চালু হওয়ার পর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন সিটিসেলের মনোপলি ভাঙেন। ২০১৩ সালে আমরা ৩জির ও ২০১৮ সালে ৪জির যুগে পা ফেলি। যদিও দেশে মোবাইল প্রযুক্তির বিস্তৃতি বলতে এখনও আমরা ২জিকেই বিবেচনা করি– ৩জি ও ৪জির তেমন প্রভাব পড়েনি, তবুও এই দেশের মানুষ অতি দ্রুত নতুন প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। আমার নিজের বিবেচনায় জনগণের সাথে নীতিনির্ধারকেরা সমানতালে চলতে পারেন না। এই প্রথম আমরা দুনিয়ার মাত্র কয়েকটা দেশের কাতারে থেকে ৫জি পরীক্ষা করলাম। আমি নিজে স্পেন ও থাইল্যান্ডে ৫জি পরীক্ষা করতে দেখেছি। বাংলাদেশে তৃতীয়বারের মতো আমি ৫জির গতি দেখলাম। এই প্রযুক্তিটিকে আমার কাছে দুনিয়া বদলানোর প্রযুক্তি বলে মনে হয়েছে।

বস্তুত বিশ্বসভ্যতাকে আরও একটি নতুন স্তরে পৌঁছানোর এক মহাশক্তিধর প্রযুক্তি এখনই বিশ্ববাসীর আলোচনার টেবিলে বসবাস করছে। ২০১৮ সালে জাপান, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে ও ২০২০ সালের মধ্যে সারা দুনিয়া এই মহাপ্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু করলে আজকের দুনিয়াটিকে আমরা চিনতেই পারব না। এককথায় যদি এমন দশাটি দেখেন যে দুনিয়াতে গাড়ি চালাতে মানুষ লাগবে না, যদি দেখেন যে যন্ত্রের সাথে যন্ত্র কথা বলছে এবং মাঝখানে মানুষের প্রয়োজন নেই এবং যদি দেখেন যন্ত্র আপনার অনুভূতি বা ভাবনাচিন্তার হিসাব রাখতে পারছে বা যদি দেখেন কায়িক শ্রমের কাজগুলো অবলীলায় যন্ত্রই করে দিচ্ছে, তবে কেমন লাগবে? ধন্যবাদ বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসকে।

মোবাইল প্রজন্মের ইতিহাস

অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় না নিলেও আমরা এটুকু বিবেচনা করতে পারি, ৫জি প্রচলিত মোবাইল ব্রডব্যান্ডকে নতুন সংজ্ঞা দেবে। যে প্রযুক্তির চূড়ান্ত মানই এখনও নির্ধারিত হয়নি, সেই প্রযুক্তি আমাদের সামনে কী কী সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে, সেটি আন্দাজ করাও কঠিন। আপাতদৃষ্টে ৫জিকে শুধু তারহীন ব্রডব্যান্ড হিসেবে দেখা হলেও এর সাথে বিদ্যমান ও নতুন প্রযুক্তিসমূহ সমন্বয় করলে দুনিয়ায় জীবনযাপন করা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারায় পৌঁছাবে। আমাদের মতো দেশের জন্য এই রূপান্তরের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। খুব সঙ্গতকারণেই আমাদেরকে ডিজিটাল রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে ৫জি এবং তার সাথে যুক্ত প্রযুক্তিগুলোকে ব্যবহার করতে হবে।

অর্থনীতিবিদেরা ধারণা করছেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ফাইভজির প্রভাবে আসা নতুন পণ্য ও সেবার দাম হবে ১২ লাখ কোটি ডলার। নতুন ওই অর্থনীতিতে দ্রুত ঢুকে পড়ার প্রবল তাড়াও থাকবে বাংলাদেশের। ওয়ার্ল্ড রেডিও কমিউনিকেশন কনফারেন্স বা ডব্লিউআরসিতে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো আগামী এক যুগ পর্যন্ত ফাইভজি উন্নয়নে কাজ করবে। ২০১৯ সালের শেষে ডব্লিউআরসি সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার ফাইভজির কোন ব্যান্ড নিয়ে কী পলিসি নেবে, তার ওপর অনেকটাই ফাইভজি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নির্ভর করবে।

স্পেকট্রাম হারমোনাইজেশন খুবই প্রয়োজন। ▸

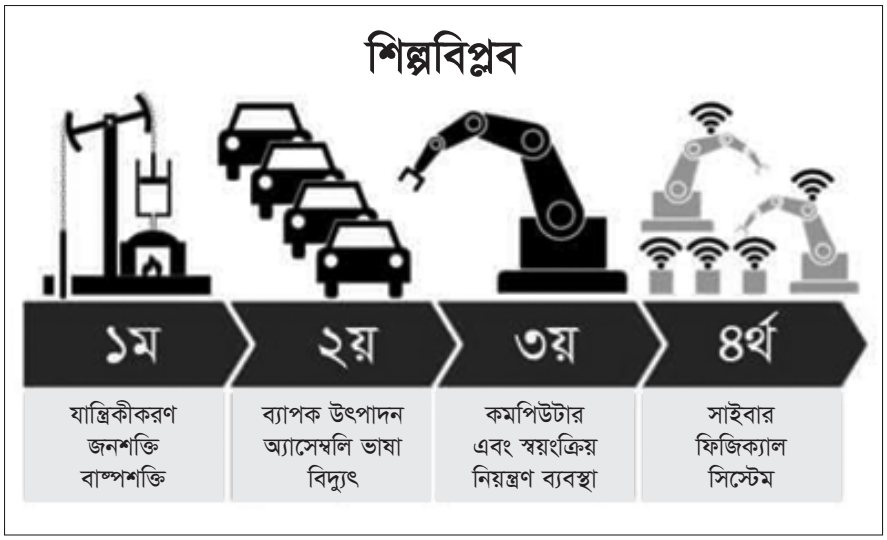

মোবাইল প্রজন্মের ইতিহাস

	১জি	২জি	৩জি	৪জি	৫জি 5G
বছর	১৯৮০-৯০	১৯৯৩	২০০১	২০০৯	২০২০
প্রযুক্তি	এনালগ	এনালগ	ডিজিটাল	ডিজিটাল	ডিজিটাল
ব্যান্ডউইডথ	ন্যারো	ন্যারো	ন্যারো	ব্রডব্যান্ড	ব্রডব্যান্ড
ডাটা রেট	২.৪৪ কেবি	৬৪-১৪৪ কেবি	১৪৪ কেবি-২ এমবি	৪ এমবি-১ জিবি	৪-২০ জিবি

এর ফলে ইকুইপমেন্ট ও ডিভাইস খরচ কমে আসে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বর্ডার এলাকায় দুটি দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডব্লিউআরসিতে আইএমটি ব্যান্ড দেখভাল করার জন্য এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি বা এপিটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত মার্চে অনুষ্ঠিত সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি বা এপিজি মিটিংয়ে সব দেশের থেকে প্রাথমিকভাবে ফাইভজির ব্যান্ডের রিভিউ পাওয়া গেছে। দেশগুলো কোন ব্যান্ড নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী, তা তুলে ধরেছে। এপিটি মেম্বার সম্মেলনে বাংলাদেশ ২৬ ও ৩২ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের কথা বলেছে, যদি পরীক্ষায় সেগুলো ব্যবহারে কোনো বাধা না পাওয়া যায়।

জিএসএমের ওই কর্মকর্তা বলছিলেন, বাংলাদেশ সরকারকে ডব্লিউআরসি-১৯ সম্মেলনে ৩ দশমিক ৫ ও ২৬ থেকে ২৮ এবং ৪০ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বিষয়ে জোর দিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করাটা জরুরি।

তিনি বলছেন, প্রযুক্তিগত নিউট্রালিটি অর্থাৎ একই স্পেকট্রাম একাধিক সেবায় ব্যবহার করার পলিসি নিয়ে বাংলাদেশ প্রশংসিত। সেটি ফাইভজির ক্ষেত্রেও ধরে রাখতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি ফাইভজি বিনিয়োগের জন্য অর্থনীতি ধরে রাখতে হবে বাংলাদেশের। আর এটা যে বেশ চ্যালেঞ্জেরই হবে।

তারা বলছেন, সত্যিকার অর্থে ফাইভজি চালুর অনেকটাই নির্ভর করবে সরকারের পলিসি খাত-সংশ্লিষ্টদের প্রতি কতটুকু উদার হচ্ছে তার ওপর। আর এখন পর্যন্ত যা দৃশ্যমান তাতে সরকার তার ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সবকিছু করতে উদারহস্ত।'

৫জির সহযোগী প্রযুক্তি : ৫জি প্রযুক্তির পাশাপাশি দুনিয়াতে বিকাশমান অন্যান্য প্রযুক্তির কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্স নিয়ে দুনিয়াতে আলোচনা চলছে বহুদিন ধরে। তবে ৫জির মতো ব্রডব্যান্ড সংযুক্তির সময়কালে বা প্রযুক্তির উৎকর্ষতাকে বিবেচনায় নিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স বা মেশিন লার্নিং সম্পূর্ণভাবেই একটি নতুন অভিজ্ঞতার যুগে আমাদের দেশটাকে নিয়ে যাবে। বস্তুত সারা বিশ্বের রূপান্তর থেকে আমরা আলাদা থাকতে পারব না বলে এসব প্রযুক্তির পাশাপাশি আমাদেরকে বিগডাটা, ব্লকচেইন এবং আইওটির মতো প্রযুক্তিকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব : খুব কষ্ট করার দরকার নেই, শুধু গুগলে অনুসন্ধান করলেই শিল্পবিপ্লব ৪০ বা ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব বিষয়ে অনেক তথ্যই পেয়ে যাবেন। জার্মান সরকারের উৎপাদনশীলতাকে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করার একটি প্রকল্প থেকে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ শব্দটির সূচনা হয়। ২০১১ সালের সিবিট মেলায় শব্দটির পুনর্জন্ম হয় এবং ২০১২ সালের একই মেলায় কর্মশালার মধ্য দিয়ে জার্মান সরকারের কাছে এই বিষয়ক অনেকগুলো সুপারিশ পেশ করা হয়। ২০১২ সালে যে ওয়ার্কিং গ্রুপটি প্রাথমিক সুপারিশ পেশ করেছিল, তারা ৮ এপ্রিল ২০১৩ সালে এর চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ করে। এই ওয়ার্কিং গ্রুপটিকে ইন্ডাস্ট্রি ৪০-এর জনক বলে গণ্য করা হয়।

শিল্পবিপ্লবের এই ধারাটির ৪টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়।

ক) পারস্পরিক সংযুক্তি বা ইন্টারঅপারেবিলিটি : এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ ও যন্ত্রের পারস্পরিক সংযুক্তি বা একই সূত্রে কাজ করার বিষয়টি শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে থাকবে। ইন্টারনেট অব থিংস বা আইওটিকে এই সংযুক্তির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একে অবশ্য বলা হচ্ছে আইওপি বা ইন্টারনেট অব পিপল।

খ) তথ্য স্বচ্ছতা : অপরিশোধিত সেন্সর ডাটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে বিদ্যমান বস্তুগত বিশ্বকে উপাত্ত আকারে স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

গ) কারিগরি সহায়তা : প্রযুক্তিকে মানুষের জন্য ব্যবহার করতে পারা। মানুষ কাজ করার জন্য বা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শক্তি কাজে লাগাবে। যেসব কাজ মানুষের পক্ষে করা ক্লান্তিকর, ঝুঁকিপূর্ণ, অপ্রিয়, সেইসব খাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

ঘ) বিকেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত : এই পদ্ধতিটিকে অহেতুক হস্তক্ষেপে ভারাক্রান্ত না করা ও বিকেন্দ্রীকরণভাবে পদ্ধতিটিকে কাজ করতে দেয়া।

আমরা শিল্পবিপ্লবের স্তরগুলো সম্পর্কে যে ধারণা পেলাম তাতে বোঝা যায়– প্রথমটি ছিল যন্ত্র, পানি, বিদ্যুতের শক্তিতে পরিচালিত। দ্বিতীয়টিকে বলা হচ্ছে গণ-উৎপাদন ব্যবস্থা। তৃতীয়টিকে কমপিউটার বা স্বয়ংক্রিয়তা হিসেবে এবং চতুর্থটিকে সাইবার ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল-মানবিক যুগ বলা হচ্ছে।

সোসাইটি ৫.০

জার্মানরা যখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে তাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করা শুরু করে, তার বহুদিন পর জাপান বিবেচনা করতে থাকে যে মানবসভ্যতা পঞ্চম যুগে পৌঁছাচ্ছে। তারা মানবসভ্যতার শিকারি যুগ, কৃষি যুগ, শিল্প যুগ, তথ্য যুগ বলার পর সুপার স্মার্ট যুগ হিসেবে সোসাইটি ৫০-কে চিহ্নিত করেছে। জাপানের এই ধারণাটি যতটা না সারা দুনিয়ার জন্য, তার চেয়ে বেশি জাপানের মতো বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীসমৃদ্ধ দেশগুলোর জন্য। আমাদের কথা বিবেচনা করলে তাদের ভাবনাটি আমাদের বিপরীত। কারণ আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ তরুণ। তবুও জাপানের পঞ্চম সমাজের ছোট্ট একটা বিবরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। জাপানের বর্তমান জনসংখ্যার ভাগের বয়স ৬৫ বছরের ওপরে। তারা মনে করে, ২০৫০ সালে বিশ্বের শতকরা ২০ ভাগ মানুষের বয়স ষাটের ওপরে থাকবে। তবে তারা অবশ্য এই কথাটিও বলছে, ৫০ সমাজ শুধু বুড়োদের জন্য নয়– সামগ্রিক বিবেচনায় সবার জন্যই। দেখা যাক সমাজ ৫০-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? শুরুতেই বলা হচ্ছে, সমাজ ৫০-এর জন্য পাঁচটি দেয়াল ভাঙতে হবে। ১. প্রথমেই তারা মনে করে প্রশাসন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি অফিস সংস্থা জনগণের সাথে যে দেয়াল তুলে

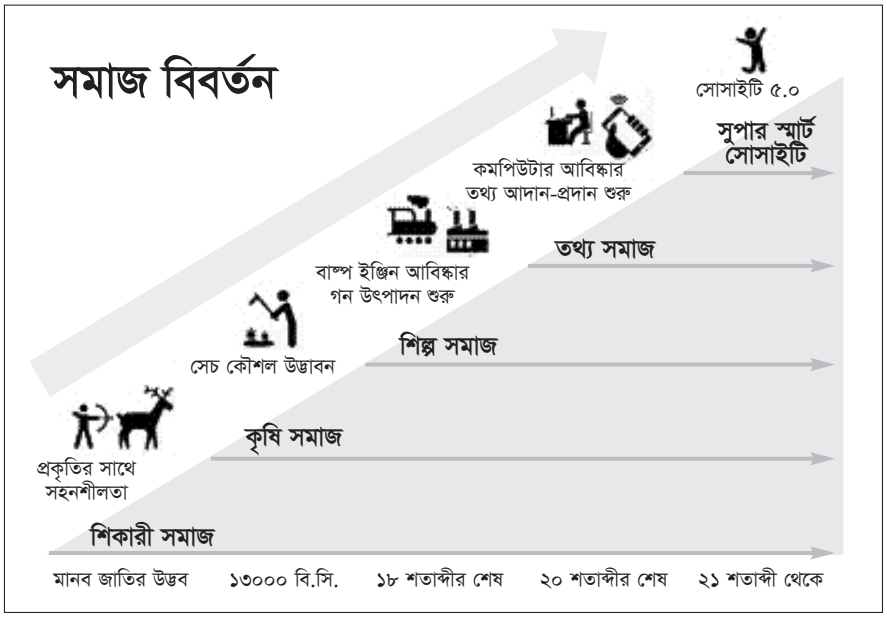

রেখেছে সেটি ভাঙতে হবে। আমি খুব সহজেই এটি অনুভব করি, একটি ডিজিটাল সরকার বিষয়ে আমাদের যে ভাবনা, এই দেয়াল ভাঙাটা তার চেয়ে বড় কিছু নয়। ২. জাপানের পঞ্চম সমাজের দ্বিতীয় সমাজটা হলো আইনের দেয়াল ভাঙা। গ) সমাজ ৫০-এর তৃতীয় দেয়ালটা হলো প্রযুক্তিরে দেয়াল। নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা ও সমাজের বিবর্তনে একে কাজে লাগানো হচ্ছে এই দেয়ালটা ভাঙা। ৪. মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক দেয়ালটা চতুর্থ দেয়াল। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সময় থেকেই এই দেয়াল ভাঙার কাজ করছি। ৫. পঞ্চম দেয়ালটি হচ্ছে পঞ্চম সমাজকে সমাজের সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করা।

আমাকে যদি ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব ৪০ বা সমাজ ৫০ সম্পর্কে মতামত দিতে বলা হয়, তবে সবিনয়ে আমরা এটি জানাতে চাই যে, '১২ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করে আমরা সারা দুনিয়ার কাছেই একটি সার্বজনীন ঘোষণা প্রকাশ করেছি। কেউ যদি আমার লেখা ২০০৭ সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা ও তার পরবর্তী নিবন্ধগুলো পাঠ করেন, তবে এটি উপলব্ধি করবেন, আমাদের আর যাই থাকুক চিন্তার দৈন্যদশা নেই। বরং আমরা সারা বিশ্বের কাছে ডিজিটাল রূপান্তরের ইশতেহারও ঘোষণা করেছি। ২০০৯ সালের তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালায় আমরা আমাদের কর্মসূচিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে শনাক্ত করতে পারিনি। কিন্তু ২০১৮ সালে আমরা সারা দুনিয়াকে ডিজিটাল রূপান্তরের স্বরূপ রচনা করে দিচ্ছি। আমাদের মতো দেশগুলো আমাদের কর্মসূচিকে তাদের মতো হুবহু অনুকরণ করতে পারে। ব্রিটেন বা জার্মানি যেমন করে আংশিক ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলছে, আমরা তার চেয়ে বহু পথ সামনে রয়েছি। জাপানও বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

আমি মনে করি, ২০২১ সালের পরবর্তী জ্ঞানভিত্তিক সমাজ, ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের দেশ বা উন্নত বাংলাদেশ কিংবা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে দেশটির ডিজিটাল রূপান্তর। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, এখন থেকে সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমরা এই প্রযুক্তির সমষ্টিকে ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, সোসাইটি ৫০, ৫জি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগডাটা বা অন্য যেকোনো নামেই ডাকি না কেন, সব অগ্রগতির নিয়ামক হচ্ছে ডিজিটাল রূপান্তর। সে জন্য আপাতত আমাদের কৌশল হলো চারটি। এই চারটি কৌশল আমাদেরকে ২০২০-২১ সাল পার করে দিতে পারে। তবে নতুন প্রেক্ষিত ও নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এই কৌশলগুলোকে পরিবর্তনশীল করতে হতে পারে। আমাদের আপাত কৌশলগুলো হলো– ১) শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, ২) সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর ও জনগণের সব সেবা ডিজিটালকরণ, ৩) শিল্প ও অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর, ৪) জনে জনে সংযুক্তি ও একটি ডিজিটাল জীবনধারা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশকে জন্মের প্রতিজ্ঞায় স্থাপন করা।

প্রথম কৌশলটি ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী মানবসম্পদ সৃষ্টি নিয়ে। আমরা এজন্য শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক। দ্বিতীয় কৌশলটি সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর বা একটি ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠাবিষয়ক। এর আওতায় সরকার পরিচালনা পদ্ধতি ডিজিটাল করা ছাড়াও জনগণের কাছে সব সংস্থার সেবাকে ডিজিটাল উপায়ে উপস্থাপন করার বিষয়টিও রয়েছে। তৃতীয় কৌশলটি মূলত শিল্প ও অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর। শিল্প-কল-কারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতির সব ধারার ডিজিটাল রূপান্তর এর প্রধান উদ্দেশ্য। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলের উদ্দেশ্য একটি ডিজিটাল, সৃজনশীল বা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিও গড়ে তোলা। চতুর্থ কৌশলটি হলো তিনটি কৌশলের সম্মিলিত রূপ বা একটি ডিজিটাল-জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নপূরণ। একই সাথে একটি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীতে একটি আধুনিক ভাষাভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন এটি।

কৌশল-১ : ডিজিটাল শিক্ষা : শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশের মতো একটি অতি জনবহুল দেশের জন্য দেশটির ডিজিটাল রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধানতম কৌশল হতে হবে এর মানবসম্পদকে সবার আগে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বা ডিজিটাল শিল্প যুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর করা। এদেশের মানবসম্পদের চরিত্র হচ্ছে, জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগই পঁয়ত্রিশের নিচের বয়সী। শতকরা ৪৯ ভাগের বয়স ২৫ বছরের নিচে। ২০১৫ সালের শুরুতে শুধু শিক্ষার্থীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ৪ কোটি। ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ৫ কোটি ছাড়িয়েছে। ঘটনাচক্রে ওরা এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে শিল্প যুগের প্রথম-দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত। ওরা চতুর্থ স্তরের শিল্পায়নের কোনো খবরও জানে না। ওদেরকে ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব, সৃজনশীল অর্থনীতি বা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির শিক্ষা দিতে না পারলে আমরা এই যুগটাকেও মিস করব। ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্য শিক্ষিতরা বেশিরভাগ প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম। অন্যদিকে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের বড় অংশটি ঘরকন্না ও কৃষিকাজে যুক্ত থাকলেও একটি স্বল্পশিক্ষিত নারী সমাজ পোশাক শিল্পে স্বল্পদক্ষ জনগোষ্ঠীতে লিপ্ত হয়ে গেছে। সামনের দিনে এই প্রবণতাটি থাকবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, বিগডাটা অ্যানালাইসিস ও রোবোটিক্স এই অবস্থার পরিবর্তন করবে। পোশাক শিল্পে একদিকে স্বল্পদক্ষ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমবে, অন্যদিকে দক্ষ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। আমাদের চ্যালেঞ্জ হবে স্বল্পদক্ষ নারীদেরকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দক্ষতা প্রদান করা। বিদ্যমান কায়িক শ্রমভিত্তিক শ্রমশক্তিকে নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করাটার প্রতি এখন থেকেই গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যদিকে নারীদের পোশাক শিল্পকেন্দ্রিক দক্ষতার ওপর একমাত্র নির্ভরতা না রেখে নতুন প্রযুক্তির দক্ষতা দিতে হবে।

পোশাক শিল্প খাতটিতে এই ধরনের আরও অনেক দক্ষ নারীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকায় এদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। এজন্য এই খাতে যথাযথ উচ্চ দক্ষতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী সমাজের জন্য প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যথাযথ নয়। এদেরকে ডিজিটাল যুগের শিক্ষা দিতে হবে। সুখের বিষয়, ডিজিটাল যুগে নারীদের কর্মক্ষেত্র এত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে যে, তাদেরকে আর পশ্চাৎপদ বলে গণ্য করার মতো অবস্থা বিরাজ করছে না।

মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রধান ধারাটি তাই নতুন রূপে গড়ে উঠতে হবে। প্রচলিত ধারার শিক্ষায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। এজন্য আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষি শ্রমিক বা শিল্প শ্রমিক গড়ে তোলার কারখানা থেকে জ্ঞানকর্মী তৈরি করার কারখানায় পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের নিজের দেশে বা বাইরের দুনিয়াতে কায়িক শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিক হিসেবে যাদেরকে কাজে লাগানো যাবে, তার বাইরের পুরো জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম ডিজিটাল কাজে সুদক্ষ তথা জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে। বস্তুত প্রচলিত ধারার শ্রমশক্তি গড়ে তোলার বাড়তি কোনো প্রয়োজনীয়তা হয়তো আমাদের থাকবে না। কারণ যে তিরিশোর্ধ জনগোষ্ঠী রয়েছে বা যারা ইতোমধ্যেই প্রচলিত ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে এবং আরও বহু বছর পেতে থাকবে, তাদের প্রচলিত কাজ করার দক্ষতা থাকছে এবং তারাই এই খাতের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। বরং এই জনগোষ্ঠী এখনই বেকারত্বের যন্ত্রণায় ভুগছে। ফলে নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তায় জ্ঞানকর্মী বানানোর কাজটাই আমাদেরকে সর্বাগ্রে করতে হবে। এর হিসাবটি একেবারেই সহজ। বিদ্যমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিলম্বে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এটি বস্তুত একটি রূপান্তর। প্রচলিত দালানকোঠা, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চি বহাল রাখলেও এর শিক্ষকের যোগ্যতা, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে হবে।

আমি ছয়টি ধারায় এই রূপান্তরের মোদ্দা কথাটা বলতে চাই–

ক) প্রথমত, প্রোগ্রামিংসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়টি শিশুশ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ৫০ নম্বর হলেও মাধ্যমিক স্তরে ১০০ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির মান হতে হবে ২০০। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইংরেজি-বাংলা-আরবি মাধ্যম নির্বিশেষে সবার জন্য এটি অবশ্য-পাঠ্য হতে হবে। পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বিষয়টিকে অপশনাল নয়, বাধ্যতামূলক করতে হবে। এজন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এই খাতের অবস্থাটি নাজুক। স্কুল ও কলেজ স্তরে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নেই। এমনকি যারা শিক্ষকতা করছেন তারা এমপিওভুক্ত নন। এই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠক্রম এবং প্রয়োজনীয় ও ▸

উন্নতমানের পাঠ্যবই থাকতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০১৮ সাল নাগাদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বিষয়টি পাঠ্য হলেও প্রাথমিকে এই বিষয়ে কোনো উদ্যোগও নেয়া হয়নি। প্রাথমিক স্তর থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স ইত্যাদিও পাঠ্য করতে হবে।

খ) দ্বিতীয়ত, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে কমপিউটার/ল্যাপটপ আনুপাতিক হিসেবে কমপিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। এই কমপিউটারগুলো শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে নিজেরা এমন যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হতে পারে রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে হবে। দেশজুড়ে বিনামূল্যের ওয়াইফাই জোন গড়ে তুললে শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করবে। ইন্টারনেটকে শিক্ষার সম্প্রসারণের বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে হবে এবং ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী করতে হবে। শিক্ষার ডিজিটাল উপাত্তকে ইন্টারনেটে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) তৃতীয়ত, প্রতিটি ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম বানাতে হবে। প্রচলিত চক, ডাস্টার, খাতা-কলম-বইকে কমপিউটার, ট্যাবলেট পিসি, স্মার্ট ফোন, বড়পর্দার মনিটর/টিভি বা প্রজেক্টর দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। প্রচলিত স্কুলের অবকাঠামোকে ডিজিটাল ক্লাসরুমের উপযুক্ত করে তৈরি করতে হবে। ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার দিয়ে করতে হবে। ক্লাসরুম মূল্যায়ন ব্যবস্থাকেও ডিজিটাল করতে হবে। এজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষ্যণ অত্যাবশ্যক।

ঘ) চতুর্থত, সব পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল যুগের জ্ঞানকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ করে সেইসব কনটেন্টকে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়নকেও ডিজিটাল করতে হবে। অবশ্যই বিদ্যমান পাঠক্রম হুবহু অনুসরণ করা যাবে না এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমে শুধু কাগজের বই দিয়ে শিক্ষাদান করা যাবে না। কনটেন্ট যদি ডিজিটাল না হয়, তবে ডিজিটাল ক্লাসরুম অচল হয়ে যাবে। এইসব কনটেন্টকে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারেকটিভ হতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ডিজিটাল যুগের বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী বিষয়বস্তু শিক্ষা দেয়া। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যত এমনসব বিষয়ে পাঠদান করা হয়, যা কৃষি বা শিল্পযুগের উপযোগী। ডিজিটাল যুগের বিষয়গুলো আমাদের দেশে পড়ানোই হয় না। সেইসব বিষয় বাছাই করে তার জন্য পাঠক্রম তৈরি করতে হবে।

ঙ) পঞ্চমত, সব শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সব আয়োজন বিফলে যাবে যদি শিক্ষকরা ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবহার করতে না পারেন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে না জানেন। তারা নিজেরা যাতে কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন, তারও প্রশিক্ষণ তাদেরকে দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকরা কোনো অবস্থাতেই পেশাদারি কনটেন্ট তৈরি করতে পারবেন না। ফলে পেশাদারি কনটেন্ট তৈরির একটি চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। প্রস্তাবিত ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল শিক্ষার গবেষণা ও প্রয়োগে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্রমান্বয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে হবে।

চ) ষষ্ঠত, তিরিশের নিচের সব মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বজুড়ে যে কাজের বাজার আছে, সেই বাজার অনুপাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের যেসব মানবসম্পদবিষয়ক প্রকল্প রয়েছে, সেগুলো কার্যকর ও সময়োপযোগী করতে হবে। দেশের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য সরকার স্থাপিত ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রগুলোও ব্যবহার হতে পারে। আমি বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের এলআইসিটি প্রকল্প, বেসিসের প্রশিক্ষণ প্রকল্পসহ, আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও অন্যান্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রকল্পগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি। এখনও প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ধারা বাস্তবমুখী ও সঠিক নয়।

ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাটি হবে সরকারের জন্য কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। এখনও যেখানে শিক্ষার হারই ৭০-এর কাছে এবং যেখানে আমরা শুধু শিল্প যুগের শিক্ষায় আছি, তাতে এটি হচ্ছে একটি মহাযজ্ঞ। তবে শিক্ষার রূপান্তর ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা ভাবাই যায় না।

কৌশল-২ : ডিজিটাল সরকার : সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর ও জনগণের সব সেবা ডিজিটালকরণ

রাষ্ট্র ও সমাজের ডিজিটাল রূপান্তরের আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সরকার নামের প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রাচীন। এর পরিচালনা পদ্ধতিও মান্ধাতার আমলের। আমরা এখন আধুনিক রাষ্ট্র নামের যে রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলি এবং জনগণের সেবক সরকার হিসেবে যে সরকারকে চিহ্নিত করি, তার ব্যবস্থাপনা বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক। এক সময়ে রাজরাজড়ারা সরকার চালাতেন। তবে সেই ব্যবস্থাকে স্থলাভিষিক্ত করেছে ব্রিটিশদের সরকার ব্যবস্থা। সেটি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে আসছি। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার এতদিন পরও সেই ব্যবস্থা প্রবল দাপটের সাথে রাজত্ব করছে। কথা ছিল সরকারটি অন্তত শিল্প যুগের উপযোগী হবে এবং তার দক্ষতাও সেই পর্যায়ের হবে। কিন্তু কৃষি যুগে থেকেই আমরা শিল্প যুগের সরকার চালাতে শুরু করার ফলে মানসিকতাসহ সব পর্যায়েই আমাদের সঙ্কট চরম পর্যায়ের। একদিকে সামন্ত মানসিকতা ও অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিকতা সরকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। '৪৭ সালে একবার ও '৭১ সালে আরেকবার পতাকা বদলের পরও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র বদলায়নি। একটি স্বাধীন জাতির জন্য যে ধরনের প্রশাসন গড়ে ওঠা দরকার, সেটিও গড়ে ওঠেনি। কাজ করার পদ্ধতি রয়ে গেছে আগের মতো। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

ক) প্রথমত, সরকারি অফিসে কাগজের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করতে হবে। '২১ সালের পর সরকারি অফিসে কাগজ ব্যবহার করা যাবে না। সরকারের সব অফিস, দফতর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় কাগজকে ডিজিটাল পদ্ধতি দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। এজন্য সরকার যেসব সেবা জনগণকে দেবে, তার সবই ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে হবে। এখানেও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি দফতরের বিদ্যমান ফাইলকে ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তর করতে হবে। নতুন ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে। এইসব ডকুমেন্টের ডিজিটাল ব্যবহার এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া ডিজিটাল করতে হবে। সরকারের মন্ত্রীবর্গসহ এর রাজনৈতিক অংশকেও এজন্য দক্ষ হতে হবে। সংসদকে ডিজিটাল হতে হবে। সংসদ সদস্যদেরকেও হতে হবে ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহারে দক্ষ। বিচার বিভাগকে কোনোভাবেই প্রচলিত রূপে রাখা যাবে না। মামলা-মোকদ্দমার বিবরণসহ বিচার কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল হতে হবে। বিচারক ও আইনজীবীদেরকে ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ, ভূমি ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সাথে সম্পৃক্ত সব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে। সরকারের কাছে থাকা অতীতের সব তথ্য ডিজিটাল করতে হবে।

খ) দ্বিতীয়ত, সরকারের সব কর্মচারী-কর্মকর্তাকে ডিজিটাল যন্ত্র দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে জানতে হবে। এজন্য সব কর্মচারী-কর্মকর্তাকে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন নিয়োগের সময় একটি বাধ্যতামূলক শর্ত থাকতে হবে যে, সরকার যেমন ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবে, সরকারে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে সেই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারতে হবে। হতে পারে যে, প্রচলিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ থেকে এই যোগ্যতা কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে না। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের শর্ত হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির ▸

সাধারণ জ্ঞানকে একটি শর্ত হিসেবে রেখে এদের সবার জন্য নতুন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে শেখাতে হবে।

গ) তৃতীয়ত, সব সরকারি অফিসকে বাধ্যতামূলকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে এবং সব কর্মকাণ্ড অনলাইনে প্রকাশিত হতে হবে। সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও সার্বক্ষণিকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে। সরকার যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছে, তার সাথে ডাটা সেন্টার স্থাপন, ডাটা সেন্টারের ব্যাকআপ তৈরি বা আরও প্রাসঙ্গিক কাজগুলো করতে হবে।

ঘ) চতুর্থত, সরকারের সব সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য জনগণের দোরগোড়ায় সেবাকেন্দ্র থাকতে হবে। যদিও এরই মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তথাপি সিটি কর্পোরেশন ও তার প্রতি ওয়ার্ডে, পৌরসভা ও তার প্রতি ওয়ার্ডে এবং সামাজিক কেন্দ্র, বাজার, ডাকঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দেশজুড়ে থাকতে হবে বিনামূল্যের ওয়াইফাই জোন। জনগণকে সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারকে সব সুযোগ দিতে হবে। থ্রিজির প্রচলন এই বিষয়টিকে সহায়তা করলেও এর ট্যারিফ এবং সহজলভ্যতার চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে। সারা দেশে বিনামূল্যের ওয়াইফাই ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

ঙ) পঞ্চমত, দেশের বিদ্যমান সব আইনকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করতে হবে এবং সেই অনুপাতে আইন ও বিচার বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রকে মেধাসম্পদ রক্ষা ও ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সব ধরনের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

চ) ষষ্ঠত, সরকারের সাথে যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিজিটাল করতে হবে। অর্থনীতি, শিল্প-কল-কারখানা, মেধাসম্পদ, আইন-বিচার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী ও সামরিক বাহিনীকে ডিজিটাল করতে হবে।

মাত্র ছয়টি করে পয়েন্টে যত ছোট করে আমি কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, তাতে মনে হতে পারে খুব সহজেই বোধহয় সব হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মনে করি, সরকার যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ২০২১ সালে একটি ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে হিমশিম খাবে। আমি নিজে মনে করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, সরকার তার নিজের প্রশাসনকে ডিজিটাল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। সরকারের জনবলের মাঝে প্রযুক্তি ব্যবহারের অদক্ষতা ছাড়াও আছে দুর্নীতির প্রকোপ। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হলে সরকারের দুর্নীতিবাজ আমলারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা ডিজিটাল রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ঠেকিয়ে দেয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভূমি, বিচার, আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দুর্নীতির কোটারি আছে। এই খাতগুলোতে যদি কঠোরভাবে ডিজিটাল রূপান্তরের প্রয়াস গ্রহণ না করা হয়, তবে ডিজিটাল সরকারের ধারণাই ভেস্তে যাবে।

কৌশল-৩ : ডিজিটাল শিল্প ও অর্থনীত

শিল্প ও অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর শিক্ষা এবং সরকার ডিজিটাল করার পর যা খুব দ্রুত ডিজিটাল হতে হবে, তা হলো অর্থনীতি। শিল্প-কল-কারখানা-ব্যবসায়-বাণিজ্য যদি প্রচলিত ধারার বাইরে বের হতে না পারে, তবে যেমন করে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজার অন্যের দখলে যাবে, তেমনি আমরা প্রতিযোগিতায় দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারব না। আজকের দুনিয়াতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ডিজিটাল হওয়াটা নতুন কোনো ঘটনাই নয়। শিল্প-কল-কারখানা যদি ডিজিটাল না হয়, তবে সেটিও দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারবে না। এজন্য আমার কয়েকটি সুপারিশ হলো–

ক) ব্যবসায়ের কেনাকাটা, লেনদেনে ডিজিটাল করতে হবে। একটি কাগজের মুদ্রাবিহীন বাণিজ্য ব্যবস্থা থেকে একটি ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

খ) ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করতে হবে। প্রচলিত খাতা-কলমের হিসাব-নিকাশ বা হাজিরা-বেতনকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে।

গ) উৎপাদন ব্যবস্থার যেখানে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, সেখানে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স বা আইটি প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে।

ঘ) ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত সবাইকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সাধারণ শিল্প যুগের দক্ষতা দিয়ে যে ডিজিটাল যুগের ব্যবসায়-বাণিজ্য করা যাবে না, তা সবাইকে বুঝতে হবে এবং সবাইকে সেভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

ঙ) ব্যবসায় বা শিল্পের ধরনকে সৃজনশীল খাতে প্রবাহিত করতে হবে। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারকে ভিত্তি করে প্রচলিত পণ্যকে সৃজনশীল পণ্যে রূপান্তর করতে হবে।

চ) সরকারকে তার অর্থনৈতিক কর্মসূচি জ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তর করতে হবে। সরকারের সব পরিকল্পনাও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিকে বিবেচনায় রেখে করতে হবে। আমরা যে ২০৪১ সালে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলব এবং আমাদের অর্থনীতি যে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি হবে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে হবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ছাড়া একটি উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না।

কৌশল-৪ : ডিজিটাল জীবনধারা

ডিজিটাল জীবনধারা ও জন্মের ঠিকানায় রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে। দেশের সব নাগরিককে ডিজিটাল যন্ত্রপ্রযুক্তি দিয়ে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে এবং তার চারপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে তার জীবনধারাটি ডিজিটাল হয়ে যায়।

আমি এই কৌশলের জন্যও ছয়টি কর্ম-পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করছি।

ক) দেশের প্রতিটি ঘরকে-প্রতিটি মানুষকে সর্বোচ্চ গতির ডিজিটাল সংযুক্তি প্রদান করা। একই সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য, সরকারি অফিস-শিক্ষাসহ সবাইকে সংযুক্তির আওতায় আনা। বস্তুত দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কমপক্ষে ১ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সুলভ হতে হবে। দেশের প্রতিইঞ্চি মাটিতে এই গতি নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি অফিস-আদালত, শহরের প্রধান প্রধান পাবলিক প্লেস, বড় বড় হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে ওয়াইফাই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্যদিকে রেডিও-টিভিসহ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সব ব্যবস্থা ইন্টারনেটে-মোবাইলে প্রাপ্য হতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতির অফিস-আদালত-শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বলা যেতে পারে, এটি হবে ইন্টারনেট সভ্যতা।

খ) ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, আইন-আদালত, সালিশ, সরকারি সেবা, হাটবাজার, জলমহাল, ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করতে হবে। জনগণ যেন এসব সেবা তার হাতের নাগালে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) মেধাশিল্প ও সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পনীতি তৈরি করতে হবে। দেশের সব প্রান্তে জ্ঞানভিত্তিক শিল্প-ব্যবসায় বাণিজ্যকে এভাবে বিকশিত করতে হবে, যাতে জনগণ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে সরাসরি অংশ নিতে পারে।

ঘ) দেশের সব আইনকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করতে হবে। মেধা সংরক্ষণ ও এর পরিচর্যার পাশাপাশি সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ঙ) ডিজিটাল বৈষম্যসহ সমাজে বিরাজমান সব বৈষম্য দূর করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

চ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে তার জন্মের অঙ্গীকারে স্থাপন করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার পাশাপাশি দেশকে জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং একাত্তরের ঘোষণা অনুযায়ী দেশের নীতি ও আদর্শকে গড়ে তুলতে হবে।

দেশটা ডিজিটাল হলো কি না তার প্যারামিটার কিন্তু ডিজিটাল জীবনধারা দিয়েই দেখতে হবে। ফলে এই কৌশলটির দিকে তাকিয়েই আমরা অনুভব করব কতটা পথ হেঁটেছি আমরা।

সার্বিক বিবেচনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ শুধু প্রযুক্তির প্রয়োগ নয়, এটি বস্তুত একটি রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ।

নিবন্ধটি শেষ করার আগে একটি প্রত্যয়ের বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেনো, সারা দেশে দ্রুতগতির ফাইবার অপটিক এবং মোবাইল ব্রডব্যান্ড পৌঁছাতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যেই এটি শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে। অন্যদিকে '২১ সালেই বাংলাদেশে ৫জি প্রচলন করতে হবে। আমাদের পরের পরিকল্পনাটি হতে হবে ৫জিনির্ভর। বস্তুত একুশ সালের পরের ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত্তি হবে ৫জি কজ